শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর

চরিতকথা সিরিজ—এক

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর

জন্ম—১৮২০ : : মৃত্যু—১৮৯১

শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী

পরিবেশক
শরৎ বুক হাউস
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬৩
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৪
প্রকাশক
এ, দে
শিশু সাহিত্য সংঘ
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
শিল্পী
ব্রজ রায়চৌধুরী
মুদ্রক
সন্তোষ কুমার ধর
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
ব্লক
দাসগুপ্ত এণ্ড কোং
১৫, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
মোহন প্রেস
২, করিস্ চার্চ লেন
গ্রন্থনা
দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০১, বৈঠকখানা রোড
বার আনা মাত্র
C.50

শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন রামজয় তর্কভূষণ। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর ছেলে ঠাকুরদাস বাড়ীর দিকে চলেছেন। বুড়োর মুখখানা আনন্দে ভরে উঠল। ছেলেকে ডেকে তিনি বললেন—ওরে দেখবি আয়, আমাদের ঘরে একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়ীর পথ ধরলেন। বাড়ীতে এসে ঠাকুরদাস গোয়াল ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। রামজয় হাসতে হাসতে বললেন—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়; আমার সঙ্গে আয়।

ভগবতী দেবীর পাশে শুয়ে আছে খুব ছোট্ট একটি ছেলে। সবে মাত্র পৃথিবীর মুখ দেখল সে। রামজয় নবজাতকের

মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে যেন কথা ছিল না। ঠাকুরদাস ও সেই নবজাত শিশুর দিকে চেয়েছিলেন—হঠাৎ বাবার কথায় তিনি যেন চমকে উঠ্‌লেন। তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর বাবা গভীর স্বরে বল্‌ছেন—একদিন এ ছেলে হবে আমাদের বংশের গৌরব, বীরসিংহ গ্রামের গৌরব, বাংলাদেশের গৌরব। কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তাই বলছিলাম আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে। আমি এর নাম দিলাম —ঈশ্বরচন্দ্র।

ছেলে দিনে দিনে বড় হয়ে উঠ্‌ছে। ঠাকুরদাস আর ভগবতী দেবীর মনে কত আশা। এ ছেলে মানুষ হবে; সত্যবাদী রামজয় তর্কভূষণ—তাঁর কথা ত মিথ্যা হতে পারে না। ঠাকুরদাস কোলকাতায় চাকরী করতেন—মাত্র দু'টাকা তাঁর মাইনে। অথচ তাঁর কত আশা, ছেলেকে দিয়ে তাঁর সব সাধ মিটে যাবে। দেখতে দেখতে ঈশ্বরচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়স হ'ল। এইবার তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রামের পাঠশালার গুরুমশায় ছিলেন সনাতন সরকার। তিনি আর কিছু না পারলেও একটা কাজ পারতেন। তাঁর ধারণা ছিল—যাতে বনের বাঘ জব্দ হয়, তাতে ছেলে জব্দ হবে না! কিন্তু ঠাকুরদাসের ছেলেকে জব্দ করবার ইচ্ছা ত ছিল না, তাই সনাতন সরকারের পাঠশালায় ছেলেকে

পাঠান হয়নি। অন্য গ্রাম থেকে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে তিনি নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। নোতুন পাঠশালা তৈরী হল। যে শিশু একদিন বিদ্যাসাগর হয়ে বাংলার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাকে নোতুন করে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর জন্য সনাতন সরকারের সনাতন ব্যবস্থার বদলে কালীকান্ত গুরুমশায়ের নোতুন পাঠশালা তৈরী হল। বিদ্যা-সাগরের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হল।

ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেটি কিন্তু মোটেই সুবিধার নয়। 'বর্ণপরিচয়ে' তিনি লিখেছেন--গোপাল বড় সুবোধ বালক; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায় মোটেই সুবোধ ছিলেন না। নিত্য নোতুন দুষ্টুমির জ্বালায় গ্রামের লোকেরা অস্থির হয়ে পড়ল। গুরু-মশায়ের কিন্তু ছাত্রের উপর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বল্‌তেন—ও কিছু নয়! ছেলেবেলায় একটু দুষ্টুমি করা ভাল। যাঁরা নালিশ করতে আসতেন, গুরুমশায় তাদের বুঝিয়ে বলতেন—ছেলেরা যদি দুষ্টুমি না করবে, তবে কি বুড়োরা দুষ্টুমি করবে। ছাত্রের উপর গুরুমশায় ছিলেন বড় খুসী। সে দুষ্টু বটে, কিন্তু পড়ালেখার সময় তার মনোযোগের সীমা নেই। একবার যা শোনে, তাই শিখে নেয়। মাত্র তিন বছরের মধ্যে পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেল। গুরুমশায়ের ইচ্ছায় ঠাকুরদাস ছেলেকে কোলকাতায় নিয়ে এলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের তখন ন'বছর বয়েস। তখন বীরসিংহ গ্রাম থেকে কোলকাতায় আসতে হলে হয় নৌকায় আস্‌তে হত, না হয় পায়ে হেঁটে আসতে হত। তাছাড়া বীরসিংহ থেকে কোলকাতা মাত্র ছাব্বিশ ক্রোশ অর্থাৎ বাহান্ন মাইল। এইটুকু পথ আবার পথ নাকি। ঠাকুরদাস তখন আট টাকা মাইনে পান। তিনি কোলকাতা থেকে পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। গরীবের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র, তাকে নিয়ে একদিন সকালবেলা ঠাকুরদাস কোলকাতার পথে পাড়ি দিলেন। দেখতে দেখতে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে গেলো, দিনের পর রাত কেটে গেলো। আবার দিনের আলো দেখা দিল। ঠাকুর-দাস মেঠো পথ পেরিয়ে এসে সিয়াখালার কাছে শাল্‌কের বাঁধা রাস্তায় উঠলেন—এখান থেকে কোলকাতা মাত্র উনিশ মাইল। আজব সহর কোলকাতা। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল কিছুদূর অন্তর বাট্‌নাবাটা শিলের মত কি যেন একটা জিনিষ মাটিতে পোঁতা আছে আর তাতে কি যেন লেখা আছে। অজানাকে জানবার কৌতুহল জাগল তাঁর মনে। তিনি বাবার কাছ থেকে জেনে নিলেন—এর নাম "মাইল স্টোন"। এর গায়ে যা লেখা আছে তা হচ্ছে ইংরাজী এক, দুই অক্ষর। এই উনিশ মাইলের মধ্যে ইংরাজী এক, দুই তাঁর শেখা হয়ে গেল।

যে শিখতে চায়, শেখার পথ সহজেই তার চোখে পড়ে; সে শিখেও নেয়।

ঈশ্বরচন্দ্র কোলকাতায় এলেন। ঠাকু'মার তিনি ছিলেন আদুরে নাতি। মা ভগবতী দেবীর চোখের মণি তিনি। কোলকাতার এই অপরিচিত জায়গায় তাঁর মন বসল না। ঠাকুরদাস পরের চাকরী করেন। তাছাড়া তিনি কঠিন প্রকৃতির মানুষ। ঈশ্বরচন্দ্রের দুঃখের সীমা রইল না। বাগবাজারে যাঁদের বাড়ীতে তিনি থাকতেন, সেখানে রাইমণি নামে একজন মহিলা থাকতেন। তাঁর ছেলে গোপাল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়সী। স্নেহময়ী রাইমণি যখন দেখলেন, ঠাকু'মা আর মাকে ছেড়ে এসে ছেলেটির বড় কষ্ট হচ্ছে, তিনি মায়ের স্নেহ দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে ঢেকে রাখলেন। পড়াশোনার ত্রুটিতে ঠাকুরদাস যখন ঈশ্বরচন্দ্রকে মারধোর করতেন, রাইমণি ছুটে এসে ঠাকুরদাসের কাছ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিতেন। সত্যি রাইমণির স্নেহের তুলনা ছিলনা। মেয়েদের দুঃখে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণ চিরদিন কাঁদত। তাঁদের দুঃখ দূর করবার জন্য তিনি সারাজীবন পরিশ্রম করেছেন। জীবনে তিনি মেয়েদের কাছ থেকে যে স্নেহের পরিচয় পেয়েছিলেন, তা তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রেরণা দিয়েছিল। ঠাকুরদাস ছিলেন গরীবের ছেলে। ছেলেবেলায় বিশেষ লেখাপড়া শেখবার তাঁর সুবিধা হয়নি। কিন্তু

লেখাপড়া তিনি বড় ভালবাসতেন। তাই নিজের জীবনে যে সাধ তাঁর পূর্ণ হয়নি, ছেলেকে দিয়ে সে সাধ মেটাবার ইচ্ছা ছিল প্রবল। তখন সামান্য ইংরাজী শিখতে পারলে ভাল চাকরী পাওয়া যেত। তাই ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরাজী শেখাবার জন্য অনেকে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নাতি, রামজয় তর্কভূষনের ছেলে ঠাকুরদাস ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন।

ছোট ছেলেটির মাথাটি ছিল দেহের তুলনায় কিছু বড়। এরপর ছাতা মাথায় দিয়ে তিনি যখন পড়তে যেতেন শুধু ছাতাটাই দেখা যেত, মানুষটাকে বড় দেখা যেত না। তাই ছেলেরা ঠাট্টা করে বলত "যশুরে কৈ"। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সবাই বুঝল—এই যশুরে কৈ বড় সামান্য ছেলে নয়।

প্রথমে ব্যাকরণ, তারপর সাহিত্য, তারপর অলংকার, তারপর স্মৃতিশাস্ত্র, তারপর বেদান্ত, তারপর ন্যায়, তারপর দর্শণ। মাত্র একুশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যের সমস্ত বিভাগের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হলেন। অধ্যাপকেরা সমবেত হয়ে তাঁকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দিলেন।

ছেলের পড়াশোনার দিকে ঠাকুরদাসের ছিল কড়া নজর। সন্ধ্যার সময় কাজ থেকে ফিরে এসে তিনি রোজ ছেলের কাছে গিয়ে বসতেন। সারাদিনে ছেলে যা কিছু শিখেছে,

বাবার কাছে মুখস্থ বলতে হত ; কোথাও একটু বেধে গেলে তার নিস্তার ছিলনা। যদি কোনদিন ঘরে ফিরে ঠাকুরদাস দেখতেন পড়তে পড়তে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠাকুরদাস তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন। তাই মারের ভয়ে খুব ঘুম পেলে ঈশ্বরচন্দ্র চোখে প্রদীপের তেল লাগিয়ে দিতেন। জ্বালার চোটে ঘুম ভেঙ্গে যেত। তিনি আবার বই টেনে নিয়ে পড়তে বসতেন।

ঠাকুরদাসের তখন সামান্য দশ টাকা মাইনে। কাজেই সবদিন তাঁর তেল কিনবার সামর্থ থাকতো না। এদিকে শুধু বাবার কাছে মারের ভয়ে নয়, ঈশ্বরচন্দ্র ভাবতেও পারতেন না যে কোনো ছেলে তাঁর চেয়ে পড়াশোনায় এগিয়ে যাবে। তাই যেদিন তেল কিনবার পয়সা থাকতো না, তিনি পড়ার বইটি নিয়ে রাস্তায় চলে যেতেন। সেখানে গ্যাসের আলোয় তিনি পড়াশোনা করতেন। রাস্তা দিয়ে কত লোক চলে যেত, চারদিকে কত গোলমাল ; কিন্তু তিনি পড়ায় এমনি তন্ময় হয়ে যেতেন যে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি থাকত না। এক একদিন রাত অনেক হয়ে গেছে, ঈশ্বরচন্দ্রের খেয়াল নেই। স্নেহপ্রবণ ঠাকুরদাস আস্তে আস্তে এসে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন।

বাড়ীর রান্নার ভার ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর। তিনি শুধু যে পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন তা নয়। তিনি নিজের হাতে বাজার করতেন, তারপর রান্না করে সকলকে খাইয়ে

নিজে খেতেন। তারপর তাঁর পড়বার অবকাশ হত। আর সে খাওয়ার বহর ছিল অত্যন্ত সাধারণ। মাছ কেনবার মত সামর্থ তাঁর বাবার ছিল না। সামান্য শাক ভাতেই তাঁদের দিন কাটত। যদি কোনদিন মাছ আসত সেই এক মাছকে তিনবার রান্না করে তিনবেলার খাওয়া চলে যেত। বোধহয় এমনি করে তাঁর শৈশব কেটেছে, তাই তিনি হয়েছেন বিদ্যাসাগর। জীবনে বড় কিছু পেতে গেলে তার মূল্য দিতে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র মূল্য দিয়েছিলেন প্রাণপণে। তাই স্বাবলম্বী এই ছেলেটির মাথায় দেবী ভারতীর আশীর্বাদ শতধারে বর্ষিত হয়েছিল।

প্রথম পরীক্ষায় তিনি যে আট টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন তাই দিয়ে ঠাকুরদাস টোল তৈরী করবার জন্য বীরসিংহ গ্রামে একখণ্ড জমি কিনেছিলেন। এটা ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সাধ। পিতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রথম বৃত্তির টাকায় বাবার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধটি মিটিয়ে ছিলেন। তারপর পরীক্ষায় তিনি যত টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন, তা দিয়ে তাঁর বাবার সমস্ত দেনা শোধ করে দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে বাবাকে তিনি তীর্থযাত্রায় পাঠিয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মহত্ত্বে তাঁর অধ্যাপকেরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ওপর তাঁদের ছিল গভীর বিশ্বাস। এমন কি তাঁদের পারিবারিক জীবনের অনেক কথাই তাঁরা ছাত্রের কাছে গল্প

করতেন, তাঁর কাছে মতামত চাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন আত্মবিশ্বাসী আর স্পষ্টবক্তা। তাঁর এই অভ্যাস সারা জীবনে তাঁকে নানা কাজে প্রেরণা দিয়েছে। নানা বড় কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, অনেক বাধা তিনি পেয়েছেন। কিন্তু যে কোন কাজ করব বলে তিনি একবার মনে করেছেন, প্রাণপণে তা করে গেছেন।

পড়ালেখা শেষ হয়ে গেল। ঈশ্বরচন্দ্র হলেন বিদ্যাসাগর। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ভালভাবে জানতেন। তাঁর আগ্রহে বিদ্যাসাগর গ্রাম থেকে ফিরে এসে পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী নিলেন। বিদ্যাসাগর কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন।

বিদ্যাসাগর জীবনে কোনদিন কোন কাজে ফাঁকি দেননি। তাই গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে বিদ্যাসাগর নিজের একান্ত চেষ্টায় তাঁর দেশকে, তাঁর মাতৃভাষাকে যা দিয়ে গেছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর এই অধ্যবসায়ের ফলে মার্শাল সাহেব তাঁর প্রতি বড় খুসী হলেন।

তখন যে সমস্ত ইংরাজ চাকরীর জন্য এদেশে আসতেন তাঁদের বাংলা ভাষা জানতে হত। বিদ্যাসাগরের ওপর এদের পরীক্ষা করবার ভার পড়ল। তিনি বুঝেছিলেন এঁরা যদি ভাল করে বাংলা শিখতে না পারেন, এ দেশের লোকের

দুঃখকষ্টের কথা বুঝতে পারবেন না ; এঁদের দিয়ে দেশের সত্যিকারের কোন উপকার হবেনা। তাই তিনি এই বাংলা পরীক্ষাকে খুব শক্ত করে তুললেন। এর ফলে অনেক ইংরাজ যুবক এই পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে চাকরী পেলনা ; দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনো উপায় রইলনা। মার্শাল সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন—ওরা বিদেশ থেকে এসেছে। ওদের পরীক্ষাটা একটু সহজ করে দিন! মার্শাল সাহেবের এই অন্যায় অনুরোধে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন—ওটি আমাকে দিয়ে হবে না ; চাকরী না হয় ছেড়ে দেব, কিন্তু অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবনা। জীবনে কোনদিন তিনি অন্যায়ের প্রশ্রয় দেননি। তাই তাঁকে উদ্দেশ করে কবি বলেছেন—"বীরসিংহের সিংহশিশু।" মার্শাল সাহেব স্বাধীন দেশের মানুষ। বিদ্যাসাগরের এই ন্যায়নিষ্ঠা দেখে তিনি আরও মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

যিনি কাজের লোক, কাজ এসে তাঁরই ঘাড়ে চাপে। ছেলেবেলা থেকে যিনি কঠিন পরিশ্রম করে এসেছেন, কাজ দেখে তাঁর ভয় পাবার কথা নয়। মার্শাল সাহেব একের পর এক তাঁকে নানা কাজের ভার দিলেন। কর্তব্যপরায়ণ বিদ্যাসাগর স্বচ্ছন্দ মনে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ একদিন কলেজ পরিদর্শন করতে এলেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর নানা কথাবার্ত্তা হল। তিনি বুঝতে পারলেন যোগ্য লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে তিনি সারা বাংলাদেশে একশটি বাঙ্‌লা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। বিদ্যাসাগর এই স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠার সমস্ত ভার নিজের হাতে নিলেন। তাঁর পরিচিত সকলেই চাকরীর জন্য কাউকে না কাউকে তাঁর কাছে পাঠালেন। কিন্তু খাতিরে যারা কাজ করে, বিদ্যাসাগর সে প্রকৃতির মানুষ নন। যোগ্য লোক ছাড়া অন্য কাউকে তিনি কাজ দিলেন না। তাঁর যে গুণে স্বাধীনচিত্ত ইংরাজ মার্শাল মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেইগুণে নিজের দেশের অপদার্থ লোকেরা তাঁর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কিন্তু সে নিন্দাকে অগ্রাহ্য করবার মত মনের জোর একমাত্র বিদ্যাসাগরেরই ছিল।

বাবা-মা'র প্রতি বিদ্যাসাগরের অচলা ভক্তি ছিল। মায়ের অনুরোধে চাকরীর মায়া ত্যাগ করে ঝড়ের রাতে সাঁতার দিয়ে দামোদর পার হয়ে যেভাবে তিনি বাড়ী গিয়েছিলেন সেকথা ভোলবার নয়। বন্ধুদের প্রতিও তাঁর ভালবাসার সীমা ছিল না। এ সম্পর্কে কত গল্প আছে। যখন বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরী করতেন তখন একবার সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপনার জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়। ঐ পদের জন্য মাইনে ছিল নব্বই টাকা। কিন্তু মার্শাল সাহেবের

প্রতি তাঁর এমনই অনুরাগ ছিল যে এই কলেজ ছেড়ে অন্য কোথাও তাঁর যাবার বাসনা ছিলনা। কিন্তু মার্শাল সাহেবের অনুরোধে তিনি ঐ পদের জন্য যোগ্য লোক এনে দেবার ভার নিলেন। তাঁর বন্ধু তারানাথ তর্কবাচস্পতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। বিদ্যাসাগরকে তিনি একটি চাকরীর জন্য বলেছিলেন। তারানাথ কোলকাতা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে কালনায় থাকতেন। যেদিন মার্শাল সাহেবের সঙ্গে তাঁর কথা হয় সেদিনটি ছিল শনিবার; আর

ভগবতী দেবী

লোকের দরকার সোমবার। কাজেই ঠিক সময়ে বাচস্পতিকে আনতে গেলে শনিবার রাত্রেই কালনায় যেতে হয়। অন্য কোন যান-বাহন ছিলনা। বন্ধুবৎসল ঈশ্বরচন্দ্র সারারাত পথ চলে রবিবার দুপুরবেলায় কালনায় বাচস্পতির বাড়ীতে গেলেন। বাচস্পতি এই অসময়ে তাঁকে দেখে অবাক হয়ে

গেলেন। তারপর সব কথা শুনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। মানুষ কি মানুষের জন্য এতখানি করতে পারে! সবাই অবশ্য পারেনা ; কিন্তু যিনি দয়ারসাগর সেই বিদ্যাসাগরের কাছে সকলই সম্ভব।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃতবিদ্যার সাগর। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ নেবার পর যখন একে একে প্রায় সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে গেল, তখন সেই সমস্ত কাজের সঙ্গে তিনি নোতুন করে ইংরাজী আর হিন্দী শিখতে সুরু করেছিলেন। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর এই দুই অপরিচিত ভাষাকে সুন্দর ভাবে আয়ত্ব করে নিলেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদটি শূন্য হয়। শিক্ষা সমিতির কর্ণধার ময়েট সাহেব এই পদের জন্য মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে বিদ্যাসাগরকেই মনোনীত করলেন। পাছে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছাড়তে না চান, সেইজন্য মার্শাল সাহেব নিজে এই চাকরিটি নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। বিদ্যাসাগর রাজী হলেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে বল্‌লেন—অন্যায়ের প্রশ্রয় আমি দেবনা, কাজেই যদি কোনদিন মতান্তর হয় আমি চাকরী ছেড়ে দেব। সাহেবেরা তাতেই রাজী হলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।

উপযুক্ত লোকের হাতে ভার পড়ল। দেখতে দেখতে সংস্কৃত কলেজের চেহারা যেন বদলে গেল। আগে পণ্ডিতেরা যখন খুসী আসতেন, যখন খুসী চলে যেতেন। ছেলেদের কলেজে আসা-যাওয়ার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিলনা। যার যা খুসী, সে তাই করত। এখন সমস্ত নিয়ম বদলে গেল। বাইরে যাবার অনুমতি-পত্র বা গেটপাসের ব্যবস্থা হল। পরীক্ষার ধারা বদলে গেল; পাঠ্যপুস্তকও নোতুন ভাবে তৈরী করা হল। পরীক্ষার ফলও দেখতে দেখতে আশাপ্রদ হয়ে উঠল। শিক্ষাবিভাগের কর্তা ময়েট সাহেব আর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরসময় দত্ত বিদ্যাসাগরের ওপর ভারী খুসী হলেন।

এই সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। এই ঘটনা থেকে বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মান জ্ঞানের একটা সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তখন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কার সাহেব। কার সাহেব এদেশী লোকদের খুব ভাল চোখে দেখতেন না। তিনি ‘নেটিভ’দের মানুষ বলে মনে করতেন না। তাই খুব বেশী দরকার না পড়লে কেউ তাঁর কাছে যেতে চাইতো না। একদিন কি একটি দরকারে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কার সাহেব তখন টেবিলের উপর পা তুলে আধশোয়া অবস্থায় চেয়ারে বসে

পাইপ টানছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর অনুমতি নিয়ে ঘরের মধ্যে এলেন। ঠিক হয়ে বসা দূরে থাকুক, সাহেব তাঁকে বসবার কথাও বললেন না। বিদ্যাসাগরের মুখখানি রাগে ও অপমানে লাল হয়ে গেল। কোন কথা না বলে নিজের কাজ সেরে তিনি চলে এলেন। তিনি বল্‌তেন, তিনি চালকলা-খেগো বামুনের ছেলে; কাজেই ধুতি-চাদর আর চটি তাঁর পোষাক। লাট সাহেবের দরবার থেকে দীনদরিদ্রের ঘর পর্যন্ত সব জায়গাতেই এই ছিল তাঁর পোষাক।

তারপর একদিন কি একটা প্রয়োজনে কার সাহেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন শুনেই তিনি তাড়াতাড়ি নিজের চটি-পরা পা-দুখানি টেবিলের ওপর তুলে খেলো হুকোয় ফড়র্ ফড়র্ করে তামাক খেতে সুরু করলেন। কার সাহেব ঘরে ঢুকলেন। বিদ্যাসাগর যেন তাঁকে দেখতেই পাননি এমনি ভাবে বসে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। কার সাহেব বিদ্যাসাগরের এই ব্যবহারে রেগে আগুন হয়ে গেলেন। কিন্তু দরকার যে তাঁর নিজের। তাই কোনো রকমে রাগ চেপে নিজের কাজ সেরে সোজা ময়েট সাহেবের দরবারে গেলেন।

কার সাহেবের নালিশ শুনে ময়েট সাহেব ত অবাক! বিদ্যাসাগরকে তিনি খুব ভাল করে চেনেন। বিদ্যাসাগর

এ রকম ব্যবহার করবেন, এ তিনি ভাবতেই পারলেন না। তবু কার সাহেব যখন অভিযোগ করেছেন, ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকে ডেকে পাঠালেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ঘরে এলে তিনি তাঁকে এ অভদ্র ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

বিদ্যাসাগর যেন অবাক হয়ে গেছেন। তাঁর কোনো দোষ হয়েছে এটা তিনি যেন বুঝতেই পারেননি। তিনি ময়েট সাহেবকে বল্‌লেন—আমি ভেবেছিলাম, আমরা অসভ্য ; সুসভ্য ইংরাজী মতে ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করতে হলে বুঝি অমন করে টেবিলের ওপর পা তুলে রাখতে হয়। একদিন কার সাহেব আমায় অমনি ভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই আমি এটা শিখেছি। কাজেই দোষ যদি কারুর হয়ে থাকে, সেটা কার সাহেবেরই হয়েছে। উদার-প্রাণ ময়েট সাহেব বুঝলেন, দোষটা কার। অভিযোগ করতে গিয়ে কার সাহেবই দোষী সাব্যস্ত হলেন। ময়েট সাহেবের আদেশে তিনি বিদ্যা-সাগরের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করলেন।

অন্যায়ের কাছে বিদ্যাসাগর কোনোদিন মাথা নত করেননি। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অধ্যক্ষ রসময় দত্তের কোন এক ব্যাপার নিয়ে বনিবনা হল না। বিদ্যাসাগর তখনি চাকরীতে ইস্তফা দিলেন। রসময়বাবু আর ময়েট সাহেবের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি চাকরীতে যোগ দিলেন না।

তিনি তখন অনেকগুলি গরীব ছাত্রকে নিজের বাড়ীতে রেখে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া বুড়ো বাপ-মাকেও মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হত। অনেকে তাঁকে ময়েট সাহেবের কথা মেনে নিতে বললেন। কিন্তু তিনি ঋণ করে বাড়ীতে টাকা পাঠাতে এবং বাড়ীতে রাখা ছাত্রদের খাওয়াতে লাগলেন। এই দুঃসময়ে ময়েট সাহেবের অনুরোধে তিনি ক্যাপ্টেন ব্যাঙ্ক নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোককে হিন্দী, বাংলা আর সংস্কৃত শেখাতেন। মাসে পঞ্চাশ টাকা হিসেবে তিনি যখন বিদ্যাসাগরকে তিন-চার'শ টাকা দিতে গেলেন, বিদ্যাসাগর সে টাকা নিলেন না। হাসিমুখে তিনি বল্‌লেন—ময়েট সাহেবের বন্ধুকে পড়িয়ে আমি টাকা নিতে পারব না।

যাঁর যোগ্যতা আছে, পৃথিবীতে তাঁর কখনও অভাব হয় না। অপদার্থের লোভে অভাবের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগরের দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেল। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের প্রয়োজন হল। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকে ভুলতে পারেননি। এবার তাঁর অনুরোধে বিদ্যাসাগর রাজী হলেন, কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানালেন—প্রিন্সিপালের ক্ষমতা যদি তাঁকে দেওয়া হয়, তবেই তিনি কাজে যোগ দিতে পারেন। এজন্য রসময় দত্ত সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করলেন। সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অবস্থা আর ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্পর্কে

বিদ্যাসাগরকে একটি রিপোর্ট দিতে বলা হ'ল। কর্তৃপক্ষ তাঁর রিপোর্ট দেখে খুব খুসী হলেন। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক আর সহ-সম্পাদকের পদ উঠে গেল। বিদ্যাসাগর হলেন সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল। নিজের একান্ত সাধনায়, সুগভীর অধ্যবসায়ের ফলে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে হলেন সংস্কৃত কলেজের সর্বময় কর্তা।

দেখতে দেখতে সংস্কৃত কলেজের চেহারা বদলে গেল। আগে যে বিশৃঙ্খলা ছিল, তা দূর হয়ে গেল। কি শিক্ষক, কি ছাত্র তাঁর সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ভারতের প্রাচীন পুঁথি-পত্রগুলি এতদিনে নষ্ট হতে বসেছিল। বিদ্যাসাগর সেগুলি যত্ন করে ছাপিয়ে দিলেন। দারুণ গরমে পড়া আর পড়ান কষ্টকর বলে তিনি বাংলা দেশে গরমের ছুটি বা 'সামার ভেকেশনের' ব্যবস্থা করলেন।

অনেকদিন আগে তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুকে সংস্কৃত শেখানোর জন্য তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি সহজবোধ্য প্রণালী আবিষ্কার করেছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি তাঁর কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। কাজেই সেই পুরাণো পুঁথি অবলম্বনে 'উপক্রমণিকা' নামে এক সহজবোধ্য ব্যাকরণ রচনা করলেন।

ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

কিন্তু ব্যাকরণের ভয়ে সংস্কৃত-সাগরে ডুবে মানিক তোলবার আশা ক্রমেই কমে আসছিল। 'উপক্রমণিকা' সেই সমস্যার সমাধান করে দিলে। বিদ্যাসাগর রামায়ণ, মহাভারত, হিতোপদেশ ইত্যাদি বই থেকে সুন্দর সুন্দর গল্প বেছে নিয়ে 'ঋজুপাঠম্' নামে বই লিখে ছেলেদের পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে দিলেন।

আন্তরিক স্নেহ সত্ত্বেও ছাত্রদের অন্যায় তিনি কঠিন হাতে দমন করতেন। একটি ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী ভাষার শিক্ষক সুপণ্ডিত কালীচরণ ঘোষের অল্প বয়সের সুযোগ নিয়ে ছেলেরা ক্লাসে গোলমাল করে তাঁকে অপমানিত করবার চেষ্টা করে। এই খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর খুব বিরক্ত হলেন। সব ছেলেকে তিনি ক্লাস থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ছেলেরা দল বেঁধে ময়েট সাহেবের কাছে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নালিশ করল। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকে ভালভাবেই চিনতেন। অভিযোগপত্রখানা বিদ্যাসাগরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁরই ওপর বিচারের ভার দিলেন। একথা শুনে ছেলেদের অভিভাবকরা জোর করে তাদের তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কালীচরণ বাবুর কাছে ক্ষমা চাইবার পর তিনি ছেলেদের মুক্তি দিলেন। তরুণ বয়সে মানুষ স্বভাবতঃই ভুল করে। যাঁরা কঠিন

হাতে তাদের বিপথ থেকে সরিয়ে আনতে পারেন, তাঁরাই প্রকৃত মানুষ।

আগে ব্রাহ্মণের ছেলে ছাড়া আর কারুর সংস্কৃত পড়বার অধিকার ছিল না। মানুষে মানুষে এতখানি তফাৎ বিদ্যাসাগর কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। হিন্দুশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। কাজেই ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ সংস্কৃত পড়তে পারবে না—এই মিথ্যাকে তিনি স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি সকল জাতির ছাত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হবার অধিকার দিলেন। এই নিয়ে চারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। "হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল"—এই বলে অনেকে চীৎকার করতে সুরু করলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর একবার যাকে উচিত বলে মনে করেছেন, হাজার চেষ্টায় তাঁকে তা থেকে টলানো গেল না। যে সংস্কৃত ভাষা দেশ থেকে প্রায় লোপ পেতে বসেছিল, সেই দেবভাষা আবার নোতুন করে মর্যাদা পেল।

বিদ্যাসাগর ছিলেন দূরদর্শী। তাই শুধু সংস্কৃতের উন্নতির ব্যবস্থা করেই তিনি চুপ করে রইলেন না। ইংরাজ এদেশ অধিকার করেছে। কাজেই দিনে দিনে ইংরাজী ভাষার মর্যাদা এদেশে বেড়ে যাবে, তা তিনি বুঝেছিলেন। তিনি নিজে যত্ন করে ইংরাজী শিখেছিলেন। তিনি জানতেন

ইংরাজী ভাষায় যে সমস্ত বই আছে তার মূল্য অনেক। তিনি বুঝেছিলেন এই ভাষার সংস্পর্শে এলে আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি হবে, আমাদের মন প্রসারিত হবে! তাই সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ভাষা ভাল করে পড়াবার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। ধীরে ধীরে সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ দেবার অনুমতি পেল। বাংলা ভাষার জন্য বিদ্যাসাগর যা করেছেন তার তুলনা হয় না। পণ্ডিতেরা বলেন, তিনি বাংলা গদ্যের জনক।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে বিদ্যাসাগর সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। ১৮৫৭ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন (কন্‌ভোকেশান) উৎসবে সংস্কৃত কলেজের কর্মধারা বিষয়ে একটি রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্ট অনুসারে তিনি বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে অনেক স্কুল তৈরী হল। বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের চারটি জেলার অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তাঁকে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হত। কাজেই বাংলা দেশকে ভালভাবে দেখাবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

তখন হ্যালিডে সাহেব ছিলেন বাংলার ছোটলাট। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হ্যালিডে সাহেব নানাভাবে বিদ্যাসাগরের কাজে সাহায্য করতেন। তিনি

বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগরকে বাদ দিয়ে বাংলা দেশের শিক্ষার কোন উন্নতি করা সম্ভব নয়। হ্যালিডে সাহেব শিক্ষা বিভাগের অনেক পরিবর্ত্তন করেন। শিক্ষা সমিতির নাম বদলে তিনি ডাইরেক্টার অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকসান বা ডি, পি, আই নামে নোতুন অফিস তৈরী করলেন। ইয়ং নামে একজন সাহেবকে সেই অফিসের কর্তা করে দিলেন। নানা কারণে এই ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগরকে সহ্য করতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে চাকরীতে ইস্তফা দেবার ব্যবস্থা করলেন। অনেক চেষ্টা করেও হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের মত বদলাতে পারলেন না। শেষে তিনি বলেছিলেন—পাঁচ'শ টাকা মাইনের চাকরী এক কথায় ছেড়ে দেওয়া কি উচিত? হ্যালিডের কথায় তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন—সাহেব, আমি গরীব বামুনের ছেলে। এক পোয়া চাল হলেই আমার চলে যায়। তবে টাকার লোভে সম্মান নষ্ট করা কি ভাল! হ্যালিডে একথার উত্তর দিতে পারেন নি। তবে তাঁর কথায় বিদ্যাসাগর আর এক বৎসর চাকরী করে শেষে সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদায় নিলেন।

এইবার বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পেলেন। তিনি বাংলার তরুণ ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে এসে তাদের সত্যিকারের অভাব বুঝেছিলেন। যে সমস্ত বই তাদের

পড়তে দেওয়া হত, সেই সমস্ত বইএর ভাষা বড় শক্ত ছিল। একদিন কোন একটি স্কুল দেখ্‌তে যাবার পথে তিনি "বর্ণপরিচয়" রচনা করেছিলেন। এই বর্ণপরিচয় বইটি দেখে আজ হয়ত কিছুই মনে হয়না। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লে বুঝতে পারা যায়, ছেলেদের জন্য কতখানি ভাবলে আর কতখানি পাণ্ডিত্য থাকলে তবে বর্ণপরিচয় লেখা যায়।

ছেলেরা পড়ালেখাকে ভয় পায় কেন? ছোট ছেলের মনের কোন বাঁধন নেই। অবাধ তার গতি। সে সদা চঞ্চল। সে একটু বেশী-খুসী মানুষ। লেখাপড়ার ভার সেই খুসীকে দমিয়ে দেয়। ছেলেটি ম্লান হয়ে যায়। বিদ্যাসাগর এটি প্রাণ দিয়ে বুঝেছিলেন। তাই পরবর্ত্তী জীবনে শিক্ষার বিভীষিকাকে ছেলেদের মন থেকে সরিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর সাধনা। এজন্য তিনি অনেক চিন্তা করে বর্ণপরিচয় রচনা করেছেন। এই বইটি পড়ে ছোট ছেলেরা কখন যে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে সুরু করে শক্ত শক্ত কথার মাধ্যমে বানান ইত্যাদি শিখে ফেলে ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ে তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারেনা। তাই বল্‌ছিলাম—যিনি বিদ্যাসাগর, বর্ণপরিচয় রচনা করা শুধু তাঁরই পক্ষে সম্ভব।

এ ছাড়া 'চরিতাবলী' 'বোধোদয়' আর 'কথামালা' বিদ্যাসাগরের অন্যতম রচনা। এই বইগুলি বাংলাদেশের

ছোটদের যে কত সাহায্য করেছে তার ইয়ত্বা নাই। কতদিন কেটে গেছে, এর মধ্যে কত বই লেখা হয়েছে, কিন্তু 'বর্ণ-পরিচয়', 'কথামালা' 'উপক্রমণিকা' আর 'ঋজুপাঠমের' সমাদর আজও কমেনি।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, দেশকে না জানলে আর মাতৃভাষার সমাদর না করলে দেশের কাজ করা যায় না। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াবার সময় তিনি বাংলার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তরুণ ছাত্রদের জন্য এমন দরদ দিয়ে দেশের ইতিহাস আগে আর কেউ লেখেননি। এই বইটি থেকে সে যুগের ছাত্ররা নিজের দেশকে জানতে পেরেছিল।

বাংলাভাষার উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যথেষ্ট করেছেন। তখন বাংলা ভাষা ছিল অনুস্বার বিসর্গ বাদ দেওয়া সংস্কৃত ভাষা। তাতে না ছিল রস-কস, না ছিল লালিত্য। পণ্ডিতেরা বাংলাভাষায় লিখতেন কিন্তু সাধারণের পক্ষে সে বই পড়া ছিল দুঃসাধ্য। আবার যাঁরা একটু ইংরাজী শিখতেন তাঁরা বাংলা বই পড়া দূরে থাক, বাংলাতে কথা বলতেও লজ্জা বোধ করতেন। ইংরাজীতে কথা বলতে পারা সে যুগের একটা গৌরবের কথা ছিল। সাহেবেরা এ দেশে এসে প্রাণপণ যত্নে বাংলা শিখতেন, কিন্তু বাঙালীরা একটু ইংরাজী শিখে বাংলায় কথা পর্যন্ত বলতে চাইতেন না।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন লোকে বাংলা পড়তে চায়না, কারণ সাধারণের পড়বার মত বই বাংলাতে নেই। অনেকদিন আগে তিনি "বেতাল পঞ্চবিংশতি" নামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটি প্রথমে কোন মর্যাদা পায়নি। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মার্শম্যান সাহেবের বইটি বড় ভাল লেগেছিল। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রতিভাকে তিনি সবার আগে সমাদর করেছিলেন। পরে বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' 'আখ্যান মঞ্জুরী,' 'মহাভারতের উপক্রমণিকা' ইত্যাদি অনেক বই লিখেছেন।

কোন জাতি উন্নত কি অবনত সেটা সেই জাতির ভাষা থেকে বোঝা যায়। রাজা রামমোহন সবার আগে বাঙলা ভাষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর পথ ধরে ভাষাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন। রামমোহনের যুগে বাংলা ভাষায় বিরাম অর্থাৎ কমা, সেমি-কোলন, কোলন, এসব কিছুই ছিলনা। বিদ্যাসাগর ইংরাজী ভাষার আদর্শে সবার আগে এই সব চিহ্নের ব্যবহার করলেন। বাংলা গদ্য পড়বার এবং পড়ে বোঝবার জন্য এতে অনেকখানি সাহায্য হয়েছে।

বিদ্যাসাগর যেমন বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি আরও নানারকম সমাজ সংস্কারের কাজ তিনি করেছিলেন। এর জন্য তাঁকে নানারকম দুঃখ

পেতে হয়েছে। তাঁর সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল একটি ব্যাপারে। সেই কথাই বল্‌ছি।

ছোটলাট বাহাদুর হ্যালিডে সাহেবের আগ্রহে তিনি মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বাংলাদেশের নানা জায়গায় স্কুল খুলেছিলেন। এই ব্যাপার নিয়েই তাঁর সঙ্গে ইয়ং সাহেবের মতান্তর হল। এক কথায় তিনি পাঁচশ' টাকার চাকরী ছেড়ে দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি বই লেখা আর অন্যান্য কাজে ডুবে গেলেন। কিন্তু ঐ স্কুলগুলি কি করে চলবে এই হ'ল তাঁর প্রধান চিন্তা। মহামতি হ্যালিডে তাঁকে বলেছিলেন—আমার কথায় আপনি এই সব স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখন গভর্ণমেণ্ট যদি টাকা না দেয়, আপনি আমার নামে কোর্টে নালিশ করতে পারেন। বিদ্যাসাগর হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর দিয়েছিলেন "আমি কোনদিন কারুর নামে নালিশ করিনি, আপনার নামেও করব না। ধার করে হোক, আর যে কোরেই হোক টাকা আমি জোগাড় করবই।"

বিদ্যাসাগর শিক্ষার মহিমা গভীর ভাবে বুঝেছিলেন। তাই তনি বীরসিংহ গ্রামে একটি মেয়েদের স্কুল এবং একটি ইংরাজী স্কুল করেছিলেন। তিনি আরও বুঝেছিলেন আমাদের দেশের সকল দুর্গতির মূলে আছে অশিক্ষা। সেই কারণে বড়দের জন্য তিনি নৈশ-বিদ্যালয়ও তৈরী করেছিলেন। এসবের জন্য

প্রতিমাসে তাঁকে তিনশ' করে টাকা দিতে হত। তখন যে সমস্ত কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন, তাতে প্রচুর টাকার দরকার হ'ত। ধার করে টাকা যোগাড় করে এই স্কুল তিনটি তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। শেষে অবশ্য স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য পেতে থাকে। এই ব্যাপারে মহামতি বেথুন সাহেব তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

বাংলাদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য বেথুন সাহেব যা করেছেন তার তুলনা হয় না। বেথুনের প্রত্যেকটি কাজে বিদ্যাসাগর তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভারতবর্ষের মেয়েরা লেখাপড়ায় কোনদিন পেছিয়ে ছিলেন না। মৈত্রেয়ী, গার্গী, লোপামুদ্রা, লীলাবতী—এঁদের নাম কে না শুনেছে। এ যুগেও রাণী ভবাণী, শ্যামাসুন্দরী এবং আরও অনেক মহীয়সী মহিলা বিদ্যা অর্জন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন বিদ্যার সাগর। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর সত্যিকার দরদ ছিল। তাই যাঁর মধ্যে তিনি এই ভাষাকে সুন্দরতর করবার প্রতিভা দেখেছেন, আকুল হয়ে ছুটে গেছেন তাঁর কাছে। এ ব্যাপারে মাইকেল মধুসুদনের নাম করা যায়।

বিদ্যাসাগর ছিলেন খুব কড়া প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু মাইকেলের প্রতিভার তিনি ছিলেন অন্ধ ভক্ত। মাইকেল বারে

বারে ভুল করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁকে বরাবর সাহায্য করেছেন। ফরাসী দেশে গিয়ে মাইকেল ঋণের দায়ে প্রায় জেলে যেতে বসেছিলেন। ধার করে টাকা পাঠিয়ে তিনি তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন। মধুসূদন বাংলা ভাষার উন্নতি করবেন এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসের বশে মাইকেলের হাজার অন্যায়কে তিনি ক্ষমা করেছেন। তাঁর এই ঋণ মাইকেল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করতেন, মাত্র তার কিছুদিন আগে আমাদের দেশে ছাপাখানা তৈরী হয়েছিল। তার আগে হাতে-লেখা পুঁথির চলন ছিল। তখন দেশে খুব বেশী মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানা ছিল না। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন ছাপাখানা যত বেশী তৈরী হবে, লেখাপড়া তত বাড়বে। তাই সংস্কৃত যন্ত্র নাম দিয়ে তিনি একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করলেন। টাকার অভাবে ধার করে তিনি মুদ্রাযন্ত্র কিনলেন। তারপর তাঁর ভাবনা হল ধার শোধ হবে কি করে। মার্শাল সাহেব তাঁর এই দুর্দিনে সাহায্য করেছিলেন। কলেজের ছাত্রদের জন্য তিনি ছয়শ' টাকায় একশ' কপি "অন্নদামঙ্গল" বই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে কিনে নিলেন। বিদ্যাসাগরের সমস্ত ধার শোধ হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগরের বইএর প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল।

তাঁর নিজের বিরাট একটি লাইব্রেরী ছিল। সংস্কৃত, বাংলা হিন্দী, ইংরাজী নানা বই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। অনেক অমূল্য হাতে-লেখা সংস্কৃত পুঁথিও তাঁর লাইব্রেরীতে ছিল। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন এমন অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথিকে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর প্রত্যেকটি বই যত্ন করে পড়ে তারপর খুব ভাল করে বাঁধিয়ে রাখতেন। এই সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে—একবার তিনি তাঁর লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা করছেন, এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোকটি আগে কখনও বিদ্যাসাগরের পাঠাগারে আসেননি। এত টাকা খরচ করে বই বাঁধান হয়েছে দেখে তিনি ঠাট্টা করে বল্‌লেন—বই বাঁধাতে এত টাকা নষ্ট না করে যদি ঐ টাকায় গরীবের উপকার করা যেত, তাতে সত্যিকারের কাজ হত। বিদ্যাসাগর চুপ করের হলেন। তারপর নানা কথাবার্তার পর তিনি ভদ্র-লোকটির গায়ের শালখানার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—বাঃ শালটি ত বড় চমৎকার। এর দাম কত? ভদ্রলোক গর্বের সঙ্গে বললেন---এর দাম পাঁচশ' টাকা। বিদ্যাসাগর নিজের গায়ের কম্বলটির দিকে চেয়ে বল্‌লেন—এর দাম পাঁচ সিকে। এতে বেশ শীত কেটে যায়। তবে এত টাকা দিয়ে শাল

কেনবার কি দরকার। এ টাকায় গরীবের কত উপকার করা যেত। ভদ্রলোক মুখের মত জবাব পেয়ে চুপ করে গেলেন। বইকে বিদ্যাসাগর প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন। বইএর এতটুকু অমর্যাদা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না।

এই সময়ে সাগরপার থেকে মেরী কারপেন্টার বলে একজন ভদ্রমহিলা এ দেশে আসেন। রাজা রামমোহন যখন বিলাতে ছিলেন তখন এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রামমোহনকে দেখে ইনি বাংলা দেশকে বড় ভালবেসে ফেলেছিলেন। মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে এঁর খুব উৎসাহ ছিল। কাজেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এঁর পরিচয় হল। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ইনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। বাংলা দেশের মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা বুঝিয়ে দেবার জন্য বিদ্যাসাগর তাঁকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

একদিন মেরী কারপেন্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগর উত্তর-পাড়ার মেয়েদের স্কুল দেখ্‌তে যাচ্ছিলেন। মোড় ঘুরতে গিয়ে তাঁর গাড়ী উল্‌টে গেল। বিদ্যাসাগর গাড়ী থেকে ছিট্‌কে দূরে পড়ে গেলেন। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পথের লোক ভিড় করে মজা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কেউ এগিয়ে এসে বিপন্নের সাহায্য করল না। যে বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ার সাগর, বিপন্নের জন্য যিনি যথাসাধ্য করে গেছেন, সেই বিদ্যাসাগর

যখন অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রইলেন, তাঁকে সাহায্য করবার জন্য কেউ এগিয়ে এলোনা। যাঁর সেবায় তাঁর জ্ঞান ফিরে এল তিনি বিদেশিনী মেরী কারপেন্টার।

এই গাড়ী থেকে পড়ে যাবার পর বিদ্যাসাগরের লোহার মত শক্ত শরীর ভেঙ্গে গেল। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বল্লেন—তাঁর যকৃতে গুরুতর আঘাত লেগেছে। এরপর তিনি অনেকদিন বেঁচেছিলেন বটে, কিন্তু যকৃতের ব্যথায় তাঁকে বারেবারে কষ্ট পেতে হয়েছে। তবু কর্মে তাঁর বিরাম ছিল না। এর মধ্যেও তিনি বাংলাদেশের শিক্ষার জন্য যা করে গেছেন বাংলাদেশ তা কোনদিন ভুল্তে পারবে না। শরীরে তাঁর অসহ্য বেদনা। ডাক্তারের পরামর্শে আর বন্ধুদের অনুরোধে বিশ্রামের জন্য তাঁকে বারেবারে কার্মাটারে চলে যেতে হয়েছে। কিন্তু যখনি দেশের শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ডাক এসেছে, শরীরকে তুচ্ছ করে তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের শেষ এবং প্রধান কীর্ত্তি "বিদ্যাসাগর কলেজ।" ইংরাজী শিখবার জন্য সে যুগে বাঙালীর মনে একটা আগ্রহ এসেছিল। কিন্তু নিয়মিত ভাবে ইংরাজী শিখবার বিশেষ সুবিধা ছিলনা। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হ'য়ে সেখানে ইংরাজী শিখবার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। কিন্তু সেখানে কজনেই বা ভর্ত্তি হতে পারে।

তাই কলকাতার কয়েকজন গন্যমান্য লোক শঙ্কর ঘোষের লেনে জমিদার খেলাৎ চন্দ্র ঘোষের একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে "ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল" এই নামে একটি ইংরাজী স্কুল তৈরী করলেন। সেটা হচ্ছে আঠারশ' উনষাট সালের কথা। স্কুল চল্‌ছে কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে কাজ ভাল হচ্ছে না। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর অভিজ্ঞতা থাকায় এই স্কুলের কর্তারা তাঁকে কাজে লাগাতে চাইলেন। তাঁরা স্কুল প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরে বিদ্যাসাগরকে তাঁদের মধ্যে নিয়ে এলেন।

বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টায় ট্রেনিং স্কুল হিন্দু মেট্রো-পলিটান্ ইনষ্টিটিউসন নাম নিয়ে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে লাগল।

বিদ্যাসাগর উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের জন্য এফ, এ ও বি, এ পড়াবার অনুমতি চাইলেন।

দেশী লোকেরা এফ, এ ও বি, এ পড়াবেন; সাহেবরা সে কথা ভাবতেই পারেন না। ওরা জানেই বা কি! বিদ্যা-সাগরের আবেদনে সাহেবরা কান দিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর যা করবেন বলে স্থির করেছেন, জীবনে কোনদিন

সে পথ থেকে পেছিয়ে আসেননি। চার বছর পরে আঁটঘাঁট বেঁধে তিনি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করলেন। বহু চেষ্টায় এবার তিনি এফ, এ পড়াবার অনুমতি পেলেন। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী কলেজ। এখানে এ দেশের অধ্যাপকেরাই পড়াতেন।

অধ্যাপকেরা প্রাণ দিয়ে পড়াতে লাগলেন। আঠারশ' চুয়াত্তর সালে মেট্রোপলিটানের প্রথম ছাত্র দল এফ, এ পরীক্ষা দিল।

দেশের লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বিদ্যাসাগরের কলেজের ছেলেরা পরীক্ষা দিয়েছে। এ দেশের অধ্যাপকেরা তাদের পড়িয়েছেন। সে যুগের লোকে যেন এটা বিশ্বাসই করতে পারত না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখ্‌ল—মেট্রোপলিটানের ছেলে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। সাহেবেরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। এমনি করে পাঁচবছর কেটে গেল। মেট্রোপলিটান বি, এ পড়াবার অনুমতি পেল।

এদিকে বিদ্যাসাগরের এই কৃতিত্বে এ দেশের মঙ্গলকামীরা উৎসাহিত হলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসু এবং আরো অনেকে মিলে সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে বড় শ্রদ্ধা করতেন। বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সময় সুরেন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে যখন গোলমাল হয়েছিল তখন বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তারপর দেশের মঙ্গল চিন্তার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ যখন অসময়ে চাকরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, তখন বিদ্যাসাগরের আদর্শে আর প্রেরণায় তিনি রিপণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন।

বিদ্যাসাগর আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর অমর প্রাণের স্পর্শ এ দেশের শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত করেছে। তোমরা নোতুন দিনের তরুণ ছাত্রদল। তোমাদের মনে রাখতে হবে—তিনি গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান। লেখাপড়ার জন্য কি কষ্টটাই না সহ্য করেছেন। সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিরলস সাধক। তাই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। যদি প্রকৃত মানুষ হতে চাও, প্রাণভরে বল—

হে জাতির প্রথম শিক্ষাব্রতিন্
আজ আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।
আশীর্ব্বাদ কর—
আমাদের জীবন সত্য হোক,
সুন্দর হোক, সার্থক হোক।

—
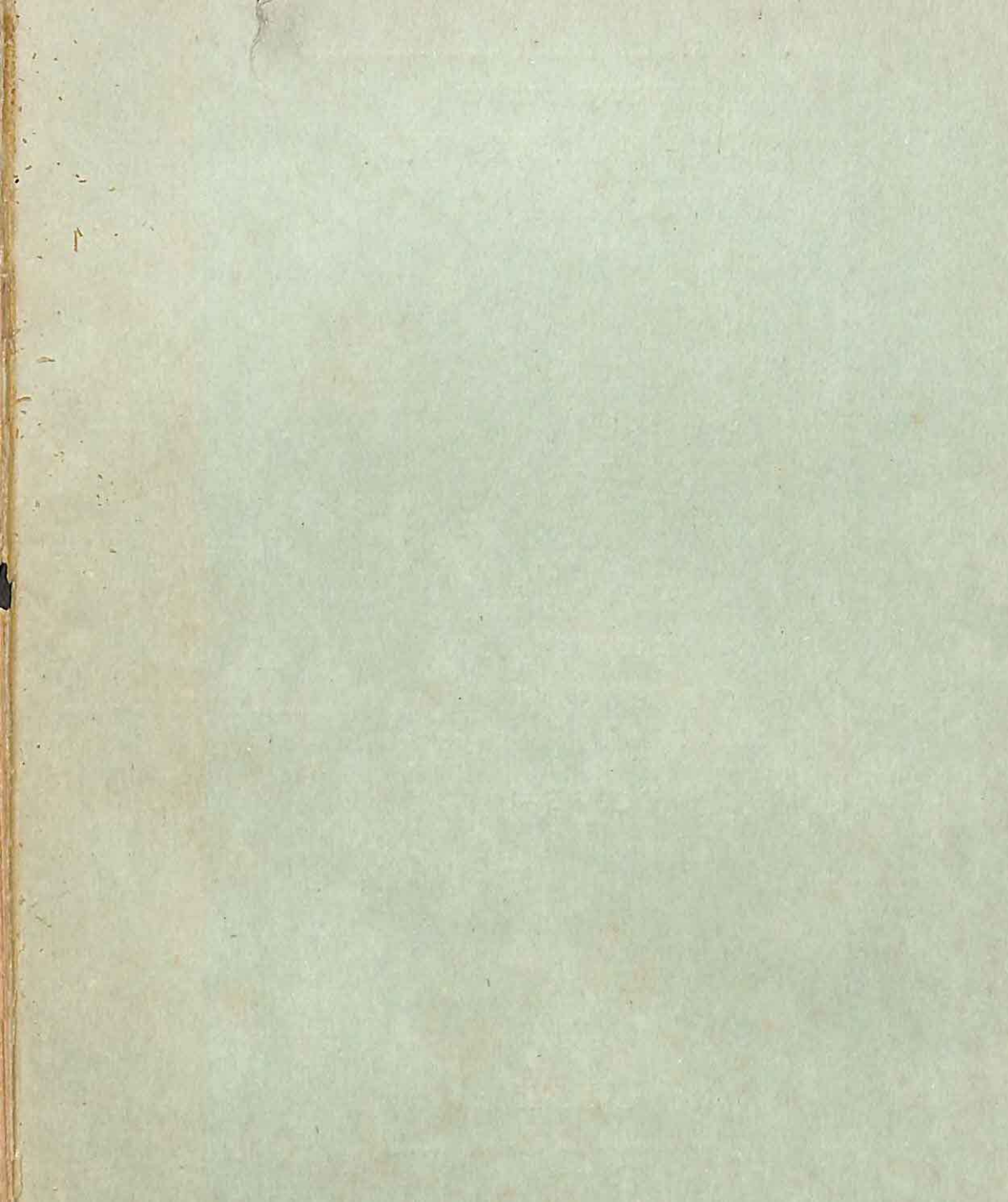
আমাদের প্রকাশিত

ছোটদের চরিতকথা সিরিজের পুস্তকাবলী

১। শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর

২। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

৩। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

৪। আচার্য জগদীশচন্দ্র

৫। তিলক মহারাজ

৬। দানবীর হরেন্দ্রকুমার

অনুবাদ সিরিজ

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

১। শেকস্‌পীয়ারের নাটকের গল্প
(ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কিংলিয়ার)

২। ছোটদের গোর্কির মা

প্রত্যেকখানা ২·০০

শিশু সাহিত্য সংসদ